ISSN 1813-0402

A RESEARCH JOURNAL

Volume-22 2016-17

গবেষণা পত্রিকা

Faculty of Arts
University of Rajshahi

A Research Journal (Faculty of Arts)
Rajshahi University

Vol. 22
Session 2016-2017
Publication
November 2016

Published by
Professor Dr. F.M.A.H. Taqui
Dean, Faculty of Arts
University of Rajshahi
Rajshahi-6205

Cover Design
Professor Abdul Matin Talukder
&
Sujan Sen

Printed by
Uttoran Printing Press
Greater Road, Rajshahi - 6100

Price : Tk. 350.00 $ 6

Contact Address
Chief Editor, A Research Journal (Faculty of Arts)
Deans Complex
Rajshahi University, Rajshahi-6205, Bangladesh

সূচিপত্র

ড. মো. একরাম হোসেন	খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার আধ্যাত্মিক দর্শন ও ধর্মীয় বিশ্বায়ন	১
ড. মো. মজিবর রহমান	আল্লাহর ধারণা সম্পর্কে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ	৯
প্রফেসর ড. মো. আসাদুজ্জামান	বাংলার চিন্তাবিদদের কর্মকাণ্ডে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মানবতাবাদ-এর প্রভাব: একটি পর্যালোচনা	১৭
সৈয়দ তৌফিক জুহরী	সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা : প্রতিবাদী চেতনা	৩৫
ড. কাজী.মো.মোস্তাফিজুর রহমান এ টি এম রফিকুল ইসলাম	ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যে বহির্দেশীয় রীতি : একটি পর্যালোচনা	৫৩
ড. মু. খলিলুর রহমান	প্রাচীন বাংলার জনজীবন : প্রসঙ্গ বরেন্দ্র অঞ্চল ১২০৪ খ্রি. পর্যন্ত	৭৯
মো. রবিউল ইসলাম	উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোতে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের প্রভাব	৯৭
ড. মো. আরিফুর রহমান	কুষ্টিয়া জেলায় নীল বিদ্রোহ : একটি সমীক্ষা	১০৫
ড. উম্মে কুলসুম আকতার বানু	উর্দু নাট্যকার আগা হাশ্‌র কাশ্মীরি : জীবন ও সাহিত্য	১২১
ড. মো. আতাউর রহমান	ইকবাল সাহিত্যে সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা : একটি পর্যালোচনা	১৩৩
ড. মো. আতাউল্যাহ	ধ্রুপদী ফারসি কাব্যে প্রেমের স্বরূপ ও প্রকৃতি অন্বেষণ	১৫৩
ড. সৈয়দ আবু আব্দুল্লাহ	হাকিম সানায়ীর কাব্যে আধ্যাত্মিকতা: একটি পর্যালোচনা	১৭১
প্রফেসর ড. মো. রেজাউল করিম	প্রেমচাঁদের বাজার-ই-হুস্‌ন উপন্যাসে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট	১৮৫
ড. মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম	মির্যা আসাদুল্লাহ খাঁন গালিব ও তাঁর সাহিত্য প্রতিভা	১৯৭
বেবী বিশ্বাস	ভবভূতির নাটকে সমাজভাবনা	২০৯
ড. শেখ মো. নূরুজ্জামান	রত্নাবলী নাটিকার চরিত্রচিত্রণ : একটি পর্যালোচনা	২২১
ড. মুহাম্মদ ইকরামুল ইসলাম	আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত : জীবন ও প্রবন্ধ প্রতিভা	২৩৭
ড. মুহা. বিলাল হুসাইন	হযরত 'আলী (রা.)-এর ভাষণ : একটি সাহিত্যিক মূল্যায়ন	২৪৯
ড. আবু সালেহ মুহাম্মদ তোহা	আধুনিক বিশ্বে আরবী সাহিত্য সমালোচনা	২৬৩
ড. মো. জাহিদুল ইসলাম	মুহাম্মদ সা. নাটকে মুহাম্মদ সা. এর নবুয়তপূর্ব জীবন : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা	২৭৩
ড. মুহাম্মদ নেছার উদ্দিন	প্রাচীন আরবী কবিতায় আরবের কৃষিকাজ : একটি পর্যালোচনা	২৮৩
ড. মো. মনিরুজ্জামান	জাহেলি যুগে আরবি সাহিত্য সমালোচনার স্বরূপ	২৯৭
ড. আবু নোমান মুহাম্মদ মাসউদুর রহমান	আর-রাগিব আল-ইসবাহানী (র) ও তাঁর 'আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুর'আন' : একটি পর্যালোচনা	৩১৩
Dr. Md. Rafiqul Islam	Baqī b. Makhlad (d. 276 A.H.) : His Contribution to the Development of Islamic Learning in al-Andalus	৩৩১
শাহ্ মোখ্‌তার আহমদ	ধর্মের ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা	৩৪১
মো. আব্দুস সোবাহান	প্রাতিষ্ঠানিক চারুকলা শিক্ষার উন্মেষ ও বিকাশ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	৩৫৩

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২২ তম সংখ্যা, ২০১৬-২০১৭, ISSN 1813-0402

প্রাতিষ্ঠানিক চারুকলা শিক্ষার উন্মেষ ও বিকাশ ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

মো. আব্দুস সোবহান*

[**Abstract**: The institutional of fine arts had been introduced in Bangladesh in 1948 that was the East Pakistan that time. Art institute (at present faculty of fine arts, University of Dhaka) was founded by some trained artists from calcutta art college of India and along with government petronization. There were no favorable atmosphare to practice fine arts at the very begining. In that time the students were learned by the realistics victorian style of fine arts. There had been added various new western features like subjectivity, was of working, conceptual knoledge and fornation at the mid of 5th decade of 20th century, because in this time some vinglurious young artists trained from western institution became habituated in the Weastern style of fine arts. After returning homeland they taught and influenced the students by that style. Being inspired by the institution of Dhaka some of fine arts were founded in Bangladesh by both govt. and private sector. This institutions also fllow the victorian style of fine arts to teach their students.]

[**সারসংক্ষেপ:** বর্তমান বাংলাদেশে তথা পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ববাংলায় ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে চারুকলা শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার সূত্রপাত ঘটে। এদেশে 'আর্ট ইনস্টিটিউটে'র (বর্তমান চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) উন্মেষ ঘটে মূলত ভারতের কলকাতা আর্ট কলেজ থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কয়েকজন শিল্পীর উদ্যম কর্মপ্রেরণা ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়। সূচনালগ্নে চারুকলা চর্চার অনুকূল পরিবেশ ছিলোনা। প্রথম থেকেই এখানে শিক্ষার্থীদের ভিক্টোরিয় শিল্পরীতিতেই বাস্তবধর্মী চিত্রবিদ্যা শেখানো হতো। তবে পঞ্চাশ দশকের মধ্যপর্যায়ে এদেশের চারুকলা চর্চায় পাশ্চাত্য দেশিয় আধুনিক করণকৌশল ও বিষয়বস্তু সম্যকজ্ঞান এবং আঙ্গিকে নতুনমাত্রা যোজিত হতে শুরু করে। কেননা এ সময় কয়েকজন উদীয়মান তরুণ শিল্পী পশ্চিমা শিল্পবিদ্যায় প্রশিক্ষণ লাভ করায় তাঁরা ক্রমশঃ এই শিল্পরীতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। দেশে ফিরে তাঁরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে পশ্চিমা শিল্পবিদ্যার প্রভাবে শিল্পচর্চায় মনোনিনেশ করেন। ঢাকাকেন্দ্রিক এই চারুকলা প্রতিষ্ঠানকেই কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারি ও বেসরকারি উদোগে বেশক'টি চারুকলা বিদ্যালয়ের বিকাশ ঘটেছে। এসব প্রতিষ্ঠানেও যথারীতি পশ্চিমা শিল্পরীতিতেই শিক্ষা প্রদান প্রচলিত রয়েছে।]

ভূমিকা

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক চারুকলা শিক্ষা আন্দোলনের ৬৮ বৎসর অতিবাহিত হয়েছে। অন্য সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে চারুকলা বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ববহ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। শিল্পী জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে চারুকলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কালেরচক্রে এই প্রতিষ্ঠানটি মহীরুহে বিকাশ লাভ করে। এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই দেশের বিভিন্ন স্থানে চারুকলা বিদ্যালয়ের দ্বার উন্মোচন হয়েছে। পশ্চিম বাংলা তথা ভারতের কলকাতায় আধুনিক চারুকলা চর্চার উন্মেষ ঘটে বস্তুত ঔপনিবেশিক শাসনামলে। এ সময় ভাগ্যান্বেষী বহু ইউরোপিয় চিত্রশিল্পী নব নব উদ্ভাবিত শিল্পকৌশল, শৈল্পিকভাবনা এবং শিল্পদর্শন সঙ্গে নিয়ে আসেন। ইংরেজরা প্রসাশনিক কাজের সুবিধার্থে পশ্চিম বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে

---

* সহযোগী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলো। এখানে পশ্চিমা শিল্পধাঁচে প্রশিক্ষণার্থীদের চিত্রবিদ্যা শেখানো হতো। সেই ধারায় বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক চারুকলা চর্চার চরিত্র, রুচিবোধ গঠিত হলেও এরই মাঝে শিল্পশিক্ষায় নিজস্ব শিল্পবোধ বিকাশ লাভ করেছে।

১. প্রাতিষ্ঠানিক চারুকলা শিক্ষার প্রারম্ভিক পর্যায়

শিল্পকলা যুগে যুগে শিল্পীদের সৃষ্টকর্মের কালের নিদের্শন। শিল্প সৃষ্টির প্রেরণার পূর্ণাঙ্গ রূপলাভ করে সুপরিকল্পিত শিল্পগঠন প্রক্রিয়ায়। যা বস্তুত শিল্পকৌশল বিদ্যার্জনের মাধ্যমে সৃজনশীল ও নৈপুণ্য অবয়ব পরিস্ফুটনে। এই লক্ষে শিল্পশিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক গুরুত্ব অপরিসীম। তাই দেখা যায়, "চারুকলার, অর্থাৎ চিত্র ও ভাস্কর্যের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, তাতে দুটো দিকের বিবেচনাটিই প্রধান–একটি হলো শিল্পের কারিগরী দিক, অর্থাৎ উপকরণ ও নির্মাণকৌশল সম্পর্কিত জ্ঞান, অন্যটি হলো এর সৃজনশীলতার দিক, অর্থাৎ কল্পনা, উদ্ভাবন, চিন্তন ইত্যাকার বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের দিক"।[১] মূলত বিশ্বে ষোড়শ খ্রিস্টাব্দে আধুনিক শিল্পান্দোলনের গোড়াপত্তনের মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে সপ্তদশ খ্রিস্টাব্দে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার প্রারম্ভিক যাত্রা। যার আলোক বর্তিকার দ্যুতি বাংলাদেশে আধুনিক শিল্পচর্চার দ্বারগোড়ায় পৌঁছে বিংশ খ্রিস্টাব্দের চল্লিশের দশকে।

যতদূর জানা যায়, ইউরোপে রেনেসাঁ যুগে অর্থাৎ সপ্তদশ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার সূচনালগ্ন। ইতালিয় রেনেসাঁ শিল্পী জর্জিয় ভাসারি ছিলেন এর জনক। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলো (Michael Angelo, ১৪৭৫-১৫৬৪) আর ইতালির ফ্লোরেন্স নগরীর ক্ষমতাধর পুঁজিপতি মেডেসি পরিবারের যৌথ উদ্যোগে চিত্র, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যকলার উন্নতির লক্ষে ফ্লোরেন্সে সর্বপ্রথম 'অকাদেমিয়া দেল দিয়ে গনো' অর্থাৎ নকশাকলা একাডেমি স্থাপিত হয়েছিলো।[২] চারুকলাকে চর্চাযোগ্য বিদ্যা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার ফলে পরবর্তীকালে ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি সম্রাট চতুর্দশ লুই সেদেশে ললিতকলা একাডেমিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। এই একাডেমি'র একান্ত প্রচেষ্টায় ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে 'স্কুল অব ফাইন আর্ট' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বিশ্বে আধুনিক শিল্পশিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হয়েছিলো। শুরুতে প্রাচীন গ্রিক মূর্তিকলা আদর্শকে আশ্রিত করে বাস্তববাদীধারায় শিল্পকর্ম বিনির্মাণে এগিয়ে আসে, যা দর্শকদের কাছে সহজেই দৃষ্টিগ্রাহ্য, গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য হয় এমন শিল্পধারা সৃষ্টির লক্ষে মূলত এসব প্রতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা গড়ে ওঠে। এবং ক্রমেই এই প্রচলিত শিক্ষাপ্রথায় উনবিংশ খ্রিস্টাব্দ থেকে ইউরোপসহ অন্যান্য দেশসমূহে পর্যায়ক্রমে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রক্রিয়া তরান্বিত হয়।

২. দেশ বিভাজনোত্তর বাংলাদেশের চারুকলা শিক্ষার উন্মেষ ও বিকাশ

চারুকলা ইনস্টিটিউট (বর্তমান চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) : বাংলাদেশে আধুনিক চারুকলা শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পচর্চার আন্দোলন ঘটে আজ থেকে আটষট্টি বৎসর পূর্বে। ঔপনিবেশিক শাসনের বেড়াজাল থেকে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করে মূলত দ্বিজাতিতত্ত্ব তথা হিন্দু ও মুসলিম মানসিক শ্রেণিদ্বন্দ্বে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই আগস্ট ভারতবর্ষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নামে সংযুক্ত এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্ম হয়।[৩] পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের নামকরণ করা হয় পূর্ব পাকিস্তান। অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ। বিভাগোত্তরকালে এদেশের বাঙালি মুসলমানরা স্বকীয় বৈশিষ্টপূর্ণ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে মানসিকভাবে দৃঢ়তা প্রকাশ করেন। এ লক্ষে দেশ বিভাজনের পরক্ষণেই কলকাতায়

শিল্পশিক্ষালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালি মুসলিম শিল্পীরা এদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। আগত শিল্পী জয়নুল আবেদিন, সফিউদ্দীন আহমেদ, আনোয়ারুল হক, কামরুল হাসান, খাজা শফিক প্রমুখ মুসলমান বাঙালি শিল্পীর শিল্পচেতনা ও একনিষ্ঠ অদম্য কর্মপ্রেরণায় "১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় সরকারি আনুকূল্যে 'ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফট্স' প্রতিষ্ঠিত হয়"।[৪] এর মাধ্যমে এদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে আধুনিক চারুকলা শিক্ষার উন্মেষ ঘটে। এই ইতিহাস অনেকেরই জানা। তবে এই খ্রিস্টাব্দের গোড়ারদিকেই এদেশের ভূখণ্ডে আঞ্চলিক প্রেক্ষিতে শিল্পচর্চার বীজ রোপিত হয়েছিলো একমাত্র স্ব-উদ্যোগে নিভৃত পল্লীতে প্রথম 'মহেশ্বর পাশা স্কুল অব আর্ট' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। শিল্পকলা সমালোচক ও অধ্যাপক শিল্পী শোভন সোমের সমীক্ষা অনুযায়ী "এই স্কুলই হল উপমহাদেশের প্রথম গ্রামীণশিল্প বিদ্যালয়"।[৫] এই প্রাথমিক চারুকলা চর্চার আন্দোলন গড়ে ওঠে, যার প্রাণপুরুষ ছিলেন শিল্পী শশীভূষণ পাল (১৮৭৭-১৯৪৫)। তাঁর স্ব-উদ্যোগ ও অদম্য কর্মপ্রেরণায় ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'মহেশ্বর পাশা স্কুল অব আর্ট' হলো বাংলাদেশের শিল্পশিক্ষা শেকড়ের উৎসভূমি। প্রসঙ্গক্রমে এই উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরা হলো–"শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন উল্লেখ করেন (১৪/১৩/১৯৭৫) যুক্ত বাংলাদেশে ইহাই 'কলিকাতা আর্ট কলেজের' পরে একমাত্র শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। স্বাক্ষর করেন কবি জসীম উদ্দিনও। একই তারিখে স্বাক্ষরিত ড. নীলিমা ইব্রাহীম মন্তব্য লেখেন–"বাংলাদেশে এটি প্রাচীনতম চারু ও কারুকলা বিদ্যালয়। ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য এ বিদ্যালয়টিকে টিকিয়ে রাখা একান্ত প্রয়োজন"।[৬]

বস্তুত স্কুল প্রতিষ্ঠার ১৩ বৎসর পর সর্বপ্রথম ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে 'বার্ষিক প্রদর্শনী' অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে স্কুলের নতুন ভবন নির্মিত হয় যশোর খুলনা সড়কের পশ্চিম পার্শ্বস্থ ভূমির উপর। অতঃপর এই স্কুলটি ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে উক্ত ভবনে স্থানান্তরিত হয়। এই নতুন ভবনটির দ্বার উন্মোচন করেছিলেন তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট এইচ. কুইনটন। এই ভবনটির ভিত্তি প্রস্তরে খোদিত লেখায় এর নিদর্শন এখনও বিদ্যমান রয়েছে স্বস্থানে– "This building has been erected by Government under the kind patrnage of H.H. The Maharajadhiraj Bahadur of Burdwan opended by H. Quinton Esqr. I.C.S. District Magistrate & Collector of Khulna 19th May 1929".[৭]

এই প্রতিষ্ঠানে চার বৎসর মেয়াদপূর্ণ শিক্ষাক্রমে ডিপ্লোমো 'ইন ফাইন আর্ট কোর্স' প্রচলিত ছিলো। শিক্ষাক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়াদি শিখানো হতো। যেমনঃ ড্রইং-পেন্সিল, চারকল-অন পেপার, ড্রইং-ব্রাশ অ্যান্ড ইঙ্ক এবং চক ড্রইং অন ব্লাকবোর্ড। এছাড়াও বিল সসপেইন্টিং, অয়েল পেইন্টিং, ক্লে মডেলিং, মোল্টিং ও এম্বডায়ারি বা সুঁচিশিল্প, ফিগার ড্রইং, পোর্ট্রেট, কপিওয়ার্ক, স্টিল লাইফ, ফিগার কম্পোজিশন। তবে এই স্কুলটি নগরকেন্দ্রিক পরিমণ্ডলে গড়ে না ওঠার কারণে মূলত এর শিল্পচর্চার গণ্ডি বিস্তৃত হতে পারেনি। ফলশ্রুতিতে আতুরঘরেই এর বিকাশ স্ফুরণের দ্বার বন্ধ হয়ে যায়।

বঙ্গদেশ বিভক্ত হওয়ার পূর্বে এবং পরে পূর্ববঙ্গে তথা পূর্ব পাকিস্তানে আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল চারুকলা শিক্ষার অনুকূলে ছিলোনা। এ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী বিরূপ প্রভাব ফেলেছিলো। একদিকে বাঙালি মুসলমান সমাজ ব্যবস্থা অন্যদিকে হিন্দু অধ্যুষিত সমাজ ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব অনেকটাই বিরাজমান ছিলো। ক্রমান্বয়ে হিন্দু রাজাদের আধিপত্যবাদের বিপর্যয়ের পরবর্তীকালে মুসলমান শাসকদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। ১৬৪৮

খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুবেদার হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন ইসলাম খাঁ। মূলত তাঁর সময়কালেই শিল্প ও বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় 'ঢাকা'। মুঘল সম্রাটদের বিশেষ আনুকূল্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের প্রতিফলন পূর্ববঙ্গে তথা বাংলাদেশে পড়তে থাকে। ঊনবিংশ খ্রিস্টাব্দে পঞ্চাশের দশক ইংরেজ শাসকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় 'ক্যালকাটা স্কুল অব আর্ট' প্রতিষ্ঠা হয়। এছাড়াও এ সময় মুর্শিদাবাদশৈলীর শিল্পীরাও জীবন ও জীবিকার নিমিত্তে কলকাতায় ভীড় জমাতে থাকলেও ঢাকাতে এঁদের আনাগোনা দেখা যায়নি। "পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর ঢাকা পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশের) রাজধানী হলে এই শহর একটি আধুনিক নগর হওয়ার সুযোগ লাভ করে"।[৮]

কলকাতায় ক্রমান্বয়ে ইউরোপিয় ও দেশিয় ঐতিহ্যের প্রচলিত শিল্পরীতিতে শিল্পচর্চার গোড়াপত্তন লক্ষণীয়। এ সময় আধুনিক চিন্তাশক্তি বিকাশ লাভ করেনি বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে। তবে বিংশ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে অল্পসংখ্যক বাঙালি মুসলমান শিল্পীরা এই অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করে শিল্পকর্ম নির্মাণে এগিয়ে আসতে শুরু করেন। এই খ্রিস্টাব্দের ত্রিশের দশক থেকেই কলকাতায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা সমূহে ছাপাকৃত চিত্র গুটিকয়েক বাঙালি মুসলমান শিল্পীর স্বাক্ষরের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। এ সময় 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রথম বাঙালি মুসলিম শিল্পী আবুল কাশেমের অংকিত চিত্র নিয়মিত প্রকাশিত হতো। এছাড়াও শিল্পী জয়নুল আবেদিন, আনোয়ারুল হক এবং কামরুল হাসান ঈদসংখ্যা 'আজাদ' পত্রিকায় নিয়মিত অঙ্গসজ্জা করতেন।

এ সময় একমাত্র পুরোপুরি পেশাদার শিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন কলকাতা আর্ট স্কুল থেকে প্রাচ্যরীতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালি মুসলিম শিল্পী আব্দুল মঈন (১৯১৩-১৯৩৯)। তিনি কলকাতা আর্ট স্কুলে একমাত্র বাঙালি মুসলিম শিক্ষক হিসেবেও যোগদান করেছিলেন। হঠাৎ টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে তিনি অকালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন অপর বাঙালি মুসলিম শিল্পী জয়নুল আবেদিন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয়। ফলে এ সময় হিন্দু ও মুসলিম শিল্পীদের মধ্যে মানসিকতার দূরত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুসলিম শিল্পীরা পৃথকভাবে চিত্রকর্ম প্রদর্শনীর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যার নেতৃত্বে দিয়েছিলেন কামরুল হাসান। এদিকে দেশ বিভাজনের পূর্বেই পাকিস্তানের লাহোরে একটি মাত্র আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা হলেও পূর্ব বাংলায় সরকারি পৃষ্টপোষতায় এরূপ উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি–একথা একেবারেই অস্বীকার করা যায় না। কেননা বিংশ খ্রিস্টাব্দের গোড়ারদিকে এই পূর্ববঙ্গেই গ্রামীণ পরিবেশে চারুশিক্ষার অংকুর গজিয়ে ছিলো, যদিও ব্রিটিশ সরকারের পৃষ্টপোষকতার অভাবে তা পুষ্ঠতা পায়নি, যা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

দেশ বিভক্তির পরক্ষণেই কলকাতায় অবস্থানরত বাঙালি মুসলমান শিল্পীরা এদেশে একটি আধুনিক শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়েন। এই লক্ষে তাঁরা একে একে স্বদেশে ফিরে আসেন। কামরুল হাসান অবশ্য 'আর্ট স্কুল' প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে এ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময় তাঁরা কর্মসংস্থান তথা জীবন ও জীবিকার অন্বেষণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। তারপরও তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেমন জয়নুল আবেদিন ঢাকার 'আরমানিটোলা নর্মাল স্কুল', সফিউদ্দীন আহমেদ 'ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল', আনোয়ারুল হক 'চট্টগ্রাম নর্মাল স্কুল', শফিকুল আমিন 'ময়মনসিংহ টিটার্স ট্রেনিং স্কুল' এবং সৈয়দ আলী আহসান

ও শেখ আনোয়ার 'আহসান উলাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল'-এ ড্রইং শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এসব প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত থাকাবস্থায় 'আর্ট স্কুল' প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তারা ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ সময় প্রধান ডি. পি. আই. ছিলেন বৈজ্ঞানিক ড. মোহাম্মদ কুদরাত-ই-খুদা। তখন ডি. পি. আই. অফিস ছিলো চট্টগ্রামে। তাঁর সঙ্গে 'আর্ট স্কুল' প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে জয়নুল আবেদিন, আনোয়ারুল হক, সফিউদ্দীন আহমেদ ও কামরুল হাসান সাক্ষাৎ করেন। তিনি 'আর্ট স্কুল' গড়ার পক্ষে আগ্রহ প্রকাশ করলেও সরকারি উচ্চ মহলের সিদ্ধান্তহীনতার কারণে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ব্যাহত হয়।

জয়নুল আবেদিন দৃঢ়মনোচিত্তে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে প্রাদেশিক মন্ত্রী হাবিব উলাহ বাহারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে 'আর্ট স্কুল' প্রতিষ্ঠা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তাঁর সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনায় দৃঢ় প্রত্যয়ের ভিত্তিতে 'আর্ট স্কুল' প্রতিষ্ঠার পথ অনেকটা সুগম হয়। এ সময় মন্ত্রী একটি প্রদর্শনীর উদ্যোগ গ্রহণে জয়নুল আবদিনের সহযোগিতা কামনা করেন। জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে কামরুল হাসান ও শফিকুল আমিন স্বল্প মূল্যের রঙ, তুলি ও কাগজ দিয়ে ৩৫টি পোস্টার এঁকেছিলেন।[৯] অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনী পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রীবর্গ, বিভিন্ন পর্যায়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের শিল্পকলা সম্পর্কিত মনোবৃত্তি জাগ্রত করতে সমর্থ হয়। তারা সহজেই অনুভব করেন যে, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রচারার্থে শিল্পীদের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করা যায় না।

এ সময় স্বাস্থ্য বিভাগের উপসচিব আবুল কাশেম একান্তভাবে সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। অন্যদিকে তৎকালীন সরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের সঙ্গে জয়নুল আবেদিন ও আলী আহসান সাক্ষাৎ করে 'আর্ট স্কুল' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিলে তিনি দৃঢ়তার সাথে সহযোগিতা প্রদানে আশ্বাস ব্যক্ত করেন। এবং একই সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার ইউনেস্কো (UNSCO)-এর একটি বিভাগের প্রধান ঢাকা অবস্থানকালে তার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেন। জয়নুল আবেদিন 'আর্ট স্কুল' প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইউনেস্কোর এই ভদ্রলোকের সঙ্গে উন্মুক্ত আলোচনা এবং তাঁর মুদ্রিত জীবনপঞ্জিসহ পোস্টকার্ড আকৃতির দূর্ভিক্ষ চিত্রের কিছু আলোকচিত্র তাঁকে প্রদান করেন। ইউনেস্কোর এই ভদ্রলোক করাচী গমন করেই 'আর্ট স্কুল' প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একটি ইতিবাচক রিপোর্ট প্রদান করার ফলশ্রুতিতে 'আর্ট স্কুল' প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হয়েছিলো।[১০]

পাকিস্তান সরকারের এই বৈরী মনোভব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শেষ অবধি তৎকালীন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আন্ডার সেক্রেটারি সলিমূলাহ ফাহমীর একান্ত সহযোগিতায় ঢাকার নবাবপুরের জনসন রোডের ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুলের পূর্ব পার্শ্বে হাসপাতাল সংলগ্ন অংশের নীচতলায় জীর্ণ কুটীরের দুটি কক্ষ বরাদ্দের ব্যবস্থা হয়। এই বরাদ্দকৃত কক্ষেই ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর ১৭/১৮ জন শিক্ষার্থী নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্লাশ শুরু হয়। 'আর্ট স্কুল' প্রতিষ্ঠার মহেন্দ্রক্ষণে এদেশের চারুকলা আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম পুরুষ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন অবশ্য দেশে অবস্থান করতে পারেননি। এর মূল কারণ ছিলো, তিনি তখন কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের অধীনে প্রচার দপ্তরের প্রধান কর্মরত থাকাবস্থায় 'আর্ট স্কুল'-এর অফিসার ইনচার্জের দ্বায়িত্ব পালন করেন শিল্পী আনোয়ারুল হক।

বেতন স্কেল ছিলো সরকারি হাই স্কুলের অনুরূপ, তবে পদগুলো ছিলো নিম্নরূপঃ প্রিন্সিপাল, লেকচারার, হেড ডিজাইনার এবং শিক্ষক। একমাত্র অধ্যক্ষ ছাড়া অন্য সবাই সরকারি হাই স্কুলের মতোই নন-গ্রেজেটেড হিসেবে যোগদান করেছিলেন। এ সময় আনোয়ারুল হক লেকচারার অব ফাইন আর্ট, সফিউদ্দীন আহমেদ লেকচারার ইন গ্রাফিক আর্ট এবং কামরুল হাসান হেড ডিজাইনার হিসেবে যোগদান করেন। হাবিবুর রহমান শিক্ষক এবং আলী আহসান ড্রাফ্‌টম্যান হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর প্রথম ছাত্র ভর্তি করার বিজ্ঞাপন পত্রিকায় প্রচারিত হয়।[১১] প্রথম পর্যায়ে আর্ট ইনস্টিটিউটে ভর্তিকৃত ছাত্রদের মধ্যে যাদের নাম এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে, তাঁদের নাম প্রথম ব্যাচের ছাত্র শিল্পী আমিনুল ইসলাম উল্লেখ করেছেন এভাবে-"১৯৪৮-এর প্রথম বর্ষে যোগদানকারী ছাত্রদের মধ্যে আমি, হামিদুর রাহমান, আবদুর রাহমান ভূঁইয়া, আবদুল কাদের, মোহাম্মদ ইসমাইল, আলফাজুদ্দিন খন্দকার, নুরুল ইসলাম, খালেদ চৌধুরী, শামসুল আলম, ইমদাদ হোসেন (কিছুদিন পরে চলে যায় এবং পরবর্তী বছর আবার ভর্তি হয়), জুলফিকার আলী, প্রভাস সেন, লোকনাথ ধর এবং আরো দু-চারজন যাদের নাম ঠিক মনে নেই। আবার এরই মধ্যে দু-তিনজন ছেড়েও চলে যায় কয়েক মাস পরেই"।[১২]

আর্ট ইনস্টিটিউটে নতুন চেয়ার টেবিল, ব্লাকবোর্ড ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নির্মাণাধীন অবস্থায় প্রথম ক্লাশ শুরু হয়। প্রথমদিকে ড্রইংপ্রধান কাজই হতো বেশি। পেন্সিল ও কালি-কলম মাধ্যমে জড়জীবন বিষয়ে কলসী কিংবা সুরাই শিখাতেন আনোয়ারুল হক। এছাড়াও তিনি পরিপ্রেক্ষিত বিষয়ে পিরামিড টুল্, চেয়ার আঁকাতে শেখাতেন। কখনো আউটডোরে কাজের জন্য রমনা পার্কে নিয়ে গাছের গুঁড়ি, পাতা সমেত ঢালপালা অনেকটা ক্লোজআপ ধাঁচে এবং শ্রেণিকক্ষে টপ সমেত পাতা বাহার ড্রইং শেখাতেন কামরুল হাসান। সফিউদ্দীন আহমেদ সাদা কালোয় মূলত কাঠখোদাই ছাপাই পদ্ধতিই শেখাতেন। এছাড়াও কলকাতা আর্ট স্কুলের ধাঁচে অজন্তা স্টাইলের কাজের অনুকরণধর্মী ড্রইংও শেখানো হতো।

ইতিমধ্যে করাচীর শিল্প-সংস্কৃতির পরিমণ্ডল থেকে নিজেকে গুটিয়ে জয়নুল আবেদিন ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। এবং ১লা মার্চ প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে স্থায়ীভাবে যোগদান করেন। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ অবধি ১৮ বছরে তাঁর কর্মনিষ্ঠা ও একাগ্রচিত্তে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ফলশ্রুতিতে ক্রমেই এদেশের চারুশিক্ষা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করতে থাকে। এ সময় অধ্যক্ষ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের প্রথম ক্লাশ নেওয়া প্রসঙ্গে শিল্পী আমিনুল ইসলাম লিখেছেন-"আবেদিন সাহেবের প্রথম ক্লাস নেওয়া আজও আমার মনে আছে। আমরা কয়েকজন বারান্দার টবে লাগানো পাতাবাহার গাছের একটি ডালের কয়েকটি পাতার ড্রইং করছি পেন্সিল দিয়ে। উনি আমার ড্রইংয়ের পাশে আরো একটি ড্রইং করে দেখাতে দেখাতে বলছিলেন, যে-ডাল থেকে পাতাটা গজিয়েছে তার বোঁটাটার দিকে নজর দিয়ে পাতার মেরুদণ্ডটা কীভাবে বেঁকে গেছে তার ছন্দটাকে ধরে পাতার আকারটাও সেই ছন্দের তালেই ড্রইংটা দেখা প্রয়োজন। তার পরেও আছে আলোর সূক্ষ্ম কারুকাজ। যে-দিকটাতে আলো বেশি পড়ছে তার লাইন হবে যথাসম্ভব সরু ও হালকা আর তার বিপরীতে লাইনগুলো হবে অপেক্ষাকৃত গাঢ় দাগে। তা-হলেই পাতাটাও প্রাণ পাবে"।[১৩]

প্রথমদিকে এই প্রতিষ্ঠানে চারটি বিভাগ নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম শুরু হয়েছিলো। মূলত কলকাতার আদলে ব্রিটিশ একাডেমি রীতি অনুসারে শিক্ষাক্রম চালু হয়। বিষয়গুলো ছিলো নিম্নরূপ : ১. প্রাথমিক বিভাগ, ২. সুকুমার কলা, ৩. বাণিজ্যিক শিল্পকলা বিভাগ এবং ৪. ছাপচিত্র বিভাগ। এ সময় শিল্প শিক্ষার্থীরা নানা প্রতিকূল অবস্থায় উপনীত হয়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে কলকাতা আর্ট স্কুল থেকে ডিগ্রি সম্পন্ন করে খাজা শফিক আহমেদ শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। এরকম অনুকূল অবস্থা অতিক্রমের মধ্যে দিয়ে এই খ্রিস্টাব্দে ৩য় বর্ষের ক্লাস চলাকালীন নতুন ছাত্র ভর্তি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ক্লাসের স্থান সংকুলান হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। সরকারের এরূপ শিক্ষা সঙ্কোচনের বিরুদ্ধে নেতৃত্বে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন শিল্পী মুর্তজা রশীর। বিষয়টি ছাত্র-শিক্ষক গুরুত্বের সঙ্গে অনুধাবন করলেন, এভাবে আন্দোলন করলে সরকারের কাছ থেকে অধিকার আদায় করা সম্ভব হবে না। তাই সার্বিক সিদ্ধান্তক্রমে চিন্তাচেতনাকে স্থিত করে ভেবে দেখলেন, চিত্র প্রদর্শনী হচ্ছে এর একমাত্র অনন্য ও অদ্বিতীয় কৌশল।

এই লক্ষে জয়নুল আবেদিনের সুস্পুষ্ট পরামর্শে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনকে প্রধান পৃষ্ঠপোষক করে 'ক্যালকাটা আর্ট গ্রুপ'-এর অনুকরণে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে 'ঢাকা আর্ট গ্রুপ' প্রতিষ্ঠা করেন। সর্বপ্রথম ঢাকায় অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীতে স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এবং কয়েকজন সৌখিন শিল্পীসহ মোট শিল্পীর সংখ্যা ছিলো ৩৪ জন। ড্রইং, জলরং স্কেচ এবং কাঠখোদাই ছাপচিত্রসহ অন্যান্য মাধ্যমের মোট ২৭৪টি শিল্পকর্ম স্থান পেয়েছিলো। বাস্তবধর্মী এসব শিল্পকর্মে ব্রিটিশ একাডেমি ধাঁচের প্রভাব লক্ষণীয় হলেও দেশ বিভাজনের উত্তরকালে প্রথম পর্যায়ের এই প্রদর্শনীটি শিল্পবোদ্ধা, শিল্পরসিক ও সরকারের উচ্চমহলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছিলো

আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষাক্রমকে পূর্ণাঙ্গ রূপদানের লক্ষে এ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানার্জনের জন্যে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জয়নুল আবেদিন সরকারি বৃত্তি লাভ করে লন্ডন গমন করেন। এ সময়ও অস্থায়ী অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন আনোয়ারুল হক। একই সময় ঢাকা 'আর্ট গ্রুপ'-এর প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে দ্বিতীয় প্রদর্শনীর প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার আদায়ের আন্দোলনের তীব্রতা দানা বেঁধে ওঠে। এমতাবস্থায় প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম পিছিয়ে যায়। এরই মধ্যে নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে প্রদর্শনী উদ্বোধনের তারিখ নির্ধারণ হয় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ। এই প্রদর্শনীও শিল্প-সমালোচক, শিল্পরসিক সর্বোপরি জনসাধারণের ব্যাপক প্রশংসা অর্জনে সমর্থ হয়েছিলো।

এ সময় কলকাতা আর্ট স্কুল থেকে ডিগ্রি প্রাপ্ত শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়া অস্থায়ী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। স্থান সংকুলানের প্রয়োজনে অবশেষে এই খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে ২৮ নং সেগুনবাগিচায় অবস্থিত প্রাক্তন কামরুন্নেছা গার্লস স্কুলের ছাত্রাবাস এবং সংগীত কলেজের সুদৃশ্য দোতলা ভবনে 'গভর্ণমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্ট' স্থানান্তরিত হয়। স্থানান্তরিত হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই জয়নুল আবেদিন লন্ডন থেকে ঢাকায় ফেরেন। 'ঢাকা আর্ট গ্রুপ'-এর দ্বিতীয় প্রদর্শনীর পর দীর্ঘদিন ঢাকায় কোনো প্রদশর্নী না হওয়ায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরনের অনাগ্রহতা সঞ্চারিত হতে থাকে। এ প্রসঙ্গে শিল্পী আমিনুল ইসলাম লিখেছেন-"আমরা কয়েকজন

তৎকালীন ডিপিআই আবদুল হাকিমের সঙ্গে দেখা করি এবং তার থেকে দুই হাজার টাকার বরাদ্দ নিয়ে মহা উৎসাহে আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রথম প্রদর্শনীর ব্যবস্থায় মেতে উঠি। এই প্রদর্শনীই প্রথমবারের মতো নিজেদের স্থানেই উদ্বোধন করা হয়, সম্ভবত জুন মাসের প্রথম দিকেই তারিখটা আজ মনে নেই; আর কে উদ্বোধন করেছিলেন তা-ও কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। কিছুতেই মনে করতে পারছিনা এই প্রদর্শনীর ক্যাটালগেও তারিখটা নেই। ছাত্র-শিক্ষক মিলিয়ে ৬৩ জন শিল্পীর ৬১৬টি চিত্রকর্ম প্রদর্শিত হয়েছিল"।[১৪]

নানা প্রতিকূলতার পথ পেরিয়ে রমনার শাহবাগস্থ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় স্থায়ীভাবে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর জনাব নূরুল আমিন অনেকটা ব্যক্তিগত উদ্যোগে 'গভর্ণমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্ট'-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন।[১৫] একই সময়ে স্থপতি মাযহারুল ইসলামের পরিকল্পিত নকশানুসারে ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয় এবং ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়। নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর এই খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর/অক্টোবর মাসে ইনস্টিটিউটটি নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়। এ সময়েও জয়নুল আবেদিন 'রফফেলার' বৃত্তি নিয়ে আমেরিকায় অবস্থান করায় আনোয়ারুল হক যথারীতি অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন।[১৬]

ক্রমেই শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং একই সঙ্গে শিক্ষকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে শিল্পী শফিকুল আমিন, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ব্যাচের ছাত্র আমিনুল ইসলাম ও শিল্পী আব্দুল বাসেত এবং ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে শিল্পী আব্দুর রাজ্জাক ও রশিদ চৌধুরী যোগদান করেন। শিক্ষাক্রমেও নতুন বিভাগ প্রবর্তন হতে থাকে। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রাচ্যকলা বিভাগ, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে মৃৎশিল্প বিভাগ ও ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ভাস্কর্য বিভাগ চালু হয়। প্রথমে পাঁচ বছর মেয়াদী সার্টিফিকেট কোর্স আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবর্তন করা হয়।[১৭] মূলত ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে তত্ত্বীয় বিষয় হিসেবে সাধারণ ইংরেজি, সভ্যতার ইতিহাস, শিল্পকলার ইতিহাস ও শিল্প সমালোচনা বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। একই খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠানটি 'পূর্ব পাকিস্তান চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়'-এ রূপান্তরিত হয়। এসময় এখানে দু'বছর মেয়াদপূর্ণ প্রি-ডিগ্রি কোর্স এবং তিন বছর মেয়াদপূর্ণ ব্যাচেলর অব ফাইন আর্ট (বি.এফ.এ.) কোর্স প্রবর্তন করা হয়।

৩. স্বাধীনতোত্তর বাংলাদেশের চারুকলা শিক্ষার বিকাশ

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনের পরবর্তীকালে পাকিস্তানের ইসলামপন্থী শাসকগোষ্ঠী ক্রমশঃ বাঙালিদের ঐতিহ্যাশ্রয়ী সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে সমূলে ধ্বংস করতে উদ্বত হয়। ফলে একই ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও বাঙালি মুসলমানরা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের শিকার হতে থাকে। পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর এরূপ বৈরী আচরণে বীর বাঙালি সমাজ কর্মীরা স্বকীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা এবং স্বাধীন ভূখণ্ডের পরিমণ্ডল প্রতিষ্ঠায় পাক-হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এসময় শিল্পশিক্ষার্থীরাও প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে। শুরু হয় স্বাধীন সার্বভৌমত্বের লড়াই। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে, শেষ অবধি লাখো বাঙালির আত্মদানে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর লাল ও সবুজ পতাকা খঁচিত 'বাংলাদেশ' নামের একটি শ্যামল স্বাধীন ভূখণ্ডের জন্ম হয়। যুদ্ধকালীন শিল্পশিক্ষা অনেকটা ব্যাহত হলেও যুদ্ধপরবর্তীকালে আবারও পুনরোদ্ধমে শিক্ষাকার্যক্রম শুরু হয়।

স্বাধীনতা উত্তরকালে 'পূর্ব পাকিস্তান চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠানটি 'বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়' হিসেবে রূপান্তরিত হয়। শিক্ষাক্রম ধারায় দু'বছর মেয়াদপূর্ণ 'মাস্টার্স অব ফাইন আর্ট' (এম. এফ. এ.) কোর্স ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তন করা হয়। এসময় নানা কারণে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের তীব্র আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এই সরকারি কলেজটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্তীকরণের মাধ্যমে 'চারুকলা ইনস্টিটিউট'-এ রূপান্তরিত হয়। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে পূর্বের প্রি-ডিগ্রি ও বি. এফ. এ. (পাস) কোর্সের পরিবর্তে চার বছর মেয়াদপূর্ণ বি. এফ. এ. (অনার্স) কোর্স এবং পূর্বের এম. এফ. এ. (সনাতন) কোর্সের পরিবর্তে দু'বছর মেয়াদপূর্ণ এম. এফ. এ. কোর্স পদ্ধতিতে শিক্ষাক্রম চালু রয়েছে। সম্প্রতি এটি চারুকলা অনুষদে রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে ৭টি ব্যবহারিকসহ একটি তত্ত্বীয় বিভাগ চালু রয়েছে। বিভাগগুলো নিম্নরূপ : ১. অংকন ও চিত্রায়ণ, ২. গ্রাফিক ডিজাইন ৩. প্রিন্টমেকিং ৪. ভাস্কর্য ৫. মৃৎশিল্প, ৬. প্রাচ্যকলা, ৭. কারুকলা এবং ৮. শিল্পকলার ইতিহাস।

চারুকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম সরকারি চারুকলা কলেজ (বর্তমান চারুকলা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়) : বস্তুত ঢাকার চারুকলা ইনস্টিটিউটের গোড়াপত্তনের মধ্য দিয়েই দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাতিষ্ঠানিক চারুকলা শিক্ষার বিকাশ ঘটে। ঢাকার বাইরে সর্বপ্রথম দেশের অন্যতম বৃহত্তম বন্দরনগরী চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত দু'টি শিল্প শিক্ষালয় গড়ে ওঠে। 'চারুকলা বিভাগ', চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, এবং 'চট্টগ্রাম সরকারি চারুকলা কলেজ'। চট্টগ্রাম মূল শহর থেকে দূরে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পর অর্থাৎ ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে কলা অনুষদ অন্তর্ভুক্ত সাবসিডিয়ারি বিষয় হিসেবে 'চারুকলা' শিক্ষার প্রারম্ভিক যাত্রা। 'চারুকলা' একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে রূপলাভ করে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের শেষেরদিকে অর্থাৎ নভেম্বর কিংবা ডিসেম্বর মাসে। প্রথমে এই বিভাগে এম. এ. (প্রিলি) সহ দু'বছরের মাস্টার্স ডিগ্রি কোর্স চালু হয়। ১৯৭৩-৭৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে তিন বছর মেয়াদপূর্ণ চারুকলায় সম্মান কোর্স প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত হয়। পরে চার বছর মেয়াদপূর্ণ সম্মান কোর্স শুরু হয় ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে।[১৮]

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগের উত্তরণের পরবর্তীকালে চারুশিক্ষার আরেকটি প্রতিষ্ঠান গড়ার উদ্যোগ গৃহীত হয়। এই লক্ষে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে শিল্পী রশিদ চৌধুরীর প্রাথমিক আলাপের পর ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জুলাই শিক্ষাবিদ আবুল ফজলের বাসায় আনুষ্ঠানিকভাবে কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি আলোচনা হয়। অবশেষে শিল্পী রশিদ চৌধুরীর একাগ্র কর্মউদ্যোগ, অক্লান্ত পরিশ্রম ও ধৈর্যের ফলশ্রুতিতে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৩রা আগষ্ট 'চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৯] দু'বছর প্রি-ডিগ্রি কোর্স শুরু হয় মূলত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের ফিডিং প্রতিষ্ঠান হিসেবে। এরপর ১৯৭৫-খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হওয়ায় ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে বি. এফ. এ. ডিগ্রি (পার্স) কোর্স প্রবর্তন করা হয়। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে ১লা নভেম্বর জাতীয়করণের মাধ্যমে 'চট্টগ্রাম সরকারি চারুকলা কলেজ'-এ রূপান্তরিত হয়। ২০১০ খ্রিস্টাব্দে চারুকলা বিভাগ এবং 'চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজ' একিভূত করে বর্তমান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট-এ রূপান্তর করা হয়। এখানে চার বছর মেয়াদি সম্মান এবং এক বছর মেয়াদপূর্ণ মাস্টার্স কোর্স প্রচলিত রয়েছে। এখানে 'অংকন ও চিত্রায়ণ', 'প্রিন্টমেকিং' এবং 'ভাস্কর্য' বিভাগ পাঠ্যক্রম চালু রয়েছে।

চারুকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (বর্তমানে চারুকলা অনুষদ) : রবেন্দ্রভূমির সংস্কৃতির ঐতিহ্য বিকাশে 'আর্ট কলেজ' থেকে 'চারুকলা বিভাগ', দীর্ঘ ৩০ বছরে এই শিক্ষালয়ের অনন্য অবদান স্বীকার করা সমীচীন। বরেন্দ্রভূমিতে একটি চারুচর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার লক্ষে 'রাজশাহীর বরেন্দ্র একাডেমি'-এর কার্যালয়ে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ৮ নভেম্বর সুধীজনের সমন্বিত একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সভাপতি হিসেবে সাংবাদিক কামাল লোহানী এবং প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব লাভ করেন শিল্পী বনিজুল হক। রাজশাহীর 'বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম'-এ ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্মবার্ষিকীতে আনুষ্ঠানিকভাবে আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার দ্বার উন্মোচন করেছিলেন পটুয়া শিল্পী কামরুল হাসান। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি 'রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়'-এ ৩০জন শিক্ষার্থী নিয়ে প্রথম ব্যাচের ক্লাশ শুরুর মাধ্যমে উত্তরাঞ্চলের বরেন্দ্রভূমিতে সর্বপ্রথম চারুশিক্ষার সূত্রপাত ঘটে। কলেজটিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ ইনস্টিটিউট হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চ কলেজটিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের হবিবুর রহমান হল সংলগ্ন রেল লাইনের পার্শ্ববর্তী মেহেরচণ্ডি গ্রামে ১০ বিঘা ভূমির উপর নির্মিত স্থায়ী ভবনে স্থানান্তর করা হয়। অবশেষে ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে কলেজটি ইনস্টিটিউটের পরিবর্তে চারুকলা বিভাগে রূপলাভ করে। পূর্ণাঙ্গ বিভাগে রূপলাভ করার পর থেকেই এখানে সাতটি গ্রুপে চার বছর মেয়াদপূর্ণ বি. এফ .এ. (অনার্স) ও এক বছর মেয়াদপূর্ণ এম. এফ. এ. কোর্স প্রবর্তিত রয়েছে। বর্তমানে এখানে চিত্রায়ণ, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ; গ্রাফিক ডিজাইন,কারুশিল্প ও শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ এবং মৃৎশিল্প ও ভাস্কর্য বিভাগ চালু রয়েছে।

চারুকলা অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

খুলনা আর্ট কলেজ (বর্তমানে চারুকলা ইনস্টিটিউট, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়) : খুলনা জেলার দৌলিতপুরের মহেশ্বর পাশা পল্লীতে ব্যক্তি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত এক সময়ের 'মহেশ্বর পাশা স্কুল অব আর্ট' থেকে আর্ট কলেজের গোড়াপত্তন। অতি সম্প্রতি এটি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ইনস্টিটিউট হিসেবে রূপলাভ করেছে। চার বছর মেয়াদি বি.এফ.এ (অনার্স) কোর্স এবং এক বছর মেয়াদি এম. এফ. এ. কোর্স প্রচলিত রয়েছে। এখানে তিনটি ডিসিপ্লিন প্রচলিত রয়েছে। যেমন : ১.অংকন ও চিত্রায়ণ, ২.প্রিন্টমেকিং এবং ৩.ভাস্কর্য।

নারায়ণগঞ্জ চারুকলা ইনস্টিটিউট : ঢাকার অদূরে নারায়ণগঞ্জের শিল্পাঞ্চলে ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে চারুশিক্ষার একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এই খ্রিস্টাব্দের ৯ই নভেম্বর 'নারায়ণগঞ্জ আর্ট কলেজ' শিরোনামে এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু। পরবর্তীকালে এর নামকরণ করা হয় 'নারায়ণগঞ্জ চারুকলা ইনস্টিটিউট' । প্রি-ডিগ্রি ও বি. এফ. এ. (অনার্স) কোর্স প্রবর্তন করা হয়, যা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত।

বগুড়া আর্ট কলেজ : উত্তরাঞ্চলে বগুড়া জেলা শহরের অভ্যন্তরভাগে চকলোমান এলাকায় ছোট্ট পরিসরে ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিক ক্লাশ শুরুর মধ্য দিয়ে 'বগুড়া আর্ট কলেজ'-এর প্রারম্ভিক যাত্রা। পাঁচ বছর মেয়াদপূর্ণ প্রি-ডিগ্রি ও বি. এফ. এ. কোর্স প্রচলিত রয়েছে। কলেজটি ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয়।

রাজশাহী চারুকলা মহাবিদ্যালয় : রাজশাহীর বরেন্দ্রভূমি শিক্ষানগরী হিসেবে সমাদৃত। শিল্প শিক্ষার বুনিয়াদ ইতোপূর্বেই গড়ে ওঠেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা অনুষদ প্রবর্তনের মাধ্যমে। এরই পথ অনুসরণ করে আরো একটি চারু শিক্ষার দ্বার উন্মোচন হয়েছে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর। রাজশাহী শহরের শিরোইল এলাকায় অবস্থিত এই চারুচর্চা কেন্দ্রের নাম 'রাজশাহী চারুকলা মহাবিদ্যালয়'। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয়। দু'বছর প্রি-ডিগ্রি এবং তিন বছর মেয়াদপূর্ণ বি. এফ. এ. কোর্স প্রবর্তিত রয়েছে।

চারুকলা অনুষদ, ইউডা : ঢাকার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ধানমন্ডি এলাকায় বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'ইউনিভার্সিটি অব ডেভোলপমেন্ট অলটারনেটিভ'-এ ২০০২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর চারুকলা অনুষদের আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটে। ধানমন্ডির রাপা প্লাজার উল্টো পার্শ্বে রোড নং-২৭-এর তৃতীয় তলায় তিন/চারটি ক্লাশ রুম নিয়ে দুই বছর মেয়াদপূর্ণ মাস্টার্স এবং চার বছর মেয়াদপূর্ণ অনার্স কোর্স সেমিস্টার পদ্ধতিতে শিক্ষাক্রম শুরু হয়। এখানে তিনটি বিভাগে পাঠ্যক্রম চালু রয়েছে যেমন: ১.পেইন্টিং, ২. প্রিন্টমেকিং এবং ৩. গ্রাফিক ডিজাইন। এছাড়াও যশোর 'এস. এম. সুলতান আর্ট কলেজ'; ময়মনসিংহে 'শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন আর্ট কলেজ': ময়মনসিংহের ত্রিশালে কবি কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে 'চারুকলা বিভাগ': জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'চারুকলা বিভাগ': জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'চারুকলা বিভাগ': ঢাকায় শান্ত-মরিয়ম বিশ্ববিদ্যালয়ে 'চারুকলা বিভাগ' এবং নড়াইলের কুড়িগ্রামে 'এস. এম. সুলতান বেঙ্গল চারুকলা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উপসংহার

বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন চারুকলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাস্তবধর্মী ও নিরীক্ষাধর্মী শিল্পচর্চা অব্যাহত রয়েছে। দেশে বিদেশে চারুকলায় উচ্চশিক্ষাগ্রহণ করে শিক্ষকগণ অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানে সক্রিয় রয়েছেন। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে অনেক শিক্ষার্থী

শিল্পী নিজস্ব শিল্পকৌশল উদ্ভাবন, স্বকীয় শিল্পরীতি, শিল্পবোধে শিল্পকর্ম সৃষ্টি করে ইতোমধ্যে দেশ-বিদেশে সুখ্যাতি অর্জনে সমর্থ হয়েছে এবং দেশে ও বিদেশের বিভিন্ন সৃজনশীল প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন। আবার অনেকেই স্বাধীনশিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে শিল্পচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন। সর্বোপরি শিল্পীরা দেশ ও বিদেশের শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে বহু পুরস্কার অর্জন করে দেশের সম্মান বৃদ্ধি করে চলেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক চারুকলা চর্চার মাধ্যমে শিল্পানুরাগী দর্শক ও ক্রেতা সৃষ্টি হয়েছে এবং চারুকলার ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধি তথা স্বকীয় চিন্তাচেতনা, স্বদেশের শিল্প-সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে বিকাশমান করতে চারুকলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভূতপূর্ব ভূমিকা স্বীকার করা সমীচীন।

তথ্যসূত্র

১ আবুল মনসুর, "চারুকলার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা", *শিল্পরূপ*, নীলিমা আফরিন (সম্পাঃ), দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা (ঢাকাঃ মোখলেছুর রহমান, জানুয়ারি-মার্চ, ২০০৮), পৃ. ২৬।

২ ফয়েজুল আজিম, *বাংলাদেশের শিল্পকলার আদিপর্ব ও ঔপনিবেশিক প্রভাব* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০০) পৃ. ৭২।

৩ *তদেব* পৃ. ৬৪।

৪ মো. আমিরুল মোমেনীন চৌধুরী, "ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে দৃশ্যশিল্প শিক্ষার চালচিত্র", *গবেষণা পত্রিকা*, নবম সংখ্যা (রাজশাহীঃ কলা অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩-২০০৪), পৃ. ৬৭।

৫ মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম অ-ঘ্রাণী, "মহেশ্বর পাশা স্কুল অব আর্ট (১৯০৪-১৯৮৩)", *ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী*, টোকন ঠাকুর (সম্পাঃ), (ঢাকাঃ খুলনা আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও বিস্মৃতির শতবর্ষ উদযাপন পরিষদ, ২০০৫) ক্যাটালগ।

৬ *তদেব।*

৭ ফয়েজুল আজিম, *বাংলাদেশের শিল্পকলার আদিপর্ব ঔপনিবেশিক প্রভাব*, পৃ. ৮৭।

৮ *তদেব*, পৃ. ৬৫।

৯ ড. আবু তাহের, *বাংলদেশের আধুনিক চিত্রকলা এবং তিনজন শিল্পী : জয়নুল আবেদিন, এস. এম. সুলতান ও রশিদ চৌধুরী* (ঢাকাঃ গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৮), পৃ. ২৪।

১০ ফয়েজুল আজিম, *বাংলাদেশের শিল্পকলার আদিপর্ব ঔপনিবেশিক প্রভাব* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ২০০০), পৃ. ৬৫।

১১ আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর* (ঢাকাঃ গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩), পৃ. ৩২।

১২ তদেব, পৃ. ৩৩।

১৩ তদেব, পৃ. ৩৪।

১৪ তদেব, পৃ. ৪৯।

১৫ ফয়েজুল আজিম, *বাংলাদেশের শিল্পকলার আদিপর্ব ঔপনিবেশিক প্রভাব* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ২০০০), পৃ. ৮৭।

১৬ আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর* (ঢাকাঃ গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩), পৃ. ২৮।

১৭ জাহান আরা রউফ, "শিল্পাচার্যের শিল্পাঙ্গন এবং শিল্পী-সমাজ", *শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন স্মারক গ্রন্থ*, মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম (সম্পাঃ), (ঢাকাঃ বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০০৬), পৃ. ৫৬।

১৮ ফয়েজুল আজিম, "চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা বিভাগ তথ্যপঞ্জি", *সৃজন স্বজন সম্মিলন* (চট্টগ্রামঃ চট্টগ্রাম চারুশিল্পী সম্মিলন, ২০০৩), কাট্যালগ।

১৯ হাসি চক্রবর্তী, "চট্টগ্রাম শিল্পকলা চর্চা", *সৃজন স্বজন সম্মিলন*, কাট্যলগ।